যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২২ মে ২০১৭

কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি চেপে বৃষ্টির দিনে শহর ঘোরার ফ্লেভারটাই আলাদা। এর ভেতর যেমন আভিজাত্য আছে, আছে টাচি অ্যাডভেঞ্চার। কেউ কেউ নিছকই শহরটাকে ঘুরে দেখার নেশায়, কেউ কেউ উপার্জনের আশায় মেঘ-রোদ-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। তা সে লাগাম হাতে ঘোড়সওয়ারি হোক কিংবা পর্যটক, সবাই। এই এগিয়ে চলা-ছুটে চলার মঝে, এই সেলফি ঝড়ের যুগেও ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরা লক্ষ্য করে পোজ দেওয়ায় পিছিয়ে নেই ঘোড়াগুলোও...

ফোটো: **প্রীতম চক্রবর্তী** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

অলকানন্দা রায়
(নৃত্যশিল্পী)

কলকাতা আমার নিজের শহর। আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা সব কিছুই তো এই কলকাতাতে। দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছরই তো কেটে গেল এই শহরে। এখান ছেড়ে অন্য শহরে থাকার অনেক সুযোগ এসেছে, কিন্তু কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকার কথা কোনওদিনও ভাবতে পারিনি। আসলে কলকাতার যে উষ্ণতা সেটা অন্য কোথাও আমি পাইনি। দেশে-বিদেশে ঘুরলেও কলকাতার উষ্ণতাটা কোথাও ফিল করিনি। কলকাতা কলকাতাই।

ভালো-খারাপ মিলিয়ে আগের থেকে কলকাতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতায় এখন অনেক কিছু মিস করি। আগে রোজ সকালে রাস্তা ধোয়া হতো। আগে কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের ল্যাম্প জ্বলত। এইগুলো ভাবলে নস্টালজিক হয়ে পড়ি। আগেকার রাস্তাঘাট কত ফাঁকা থাকত।

আর একটা জিনিস খুব মিস করি, সেটা হল আগে পাড়ার দাদারা পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারত। ওরাই কিন্তু পাড়াটাকে রক্ষা করত। কখনও আনসেফ মনে হতো না। এখন সেটা হারিয়ে গেছে। পাড়া ব্যাপারটাই উঠে গেছে। আগে কেউ বিপদে পড়লে দশজন এগিয়ে আসত, আজ এমন দৃশ্য তেমন চোখেই পড়ে না। আজ হয়তো মানুষকে সময়ের সাথে একটু বেশি দৌড়তে হয়, তবুও অন্যকে নিয়ে একটু ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। নিজে বাঁচাটাই তো সব নয়, তাই না?

আজ কলকাতার নিরাপত্তা নিয়ে প্রায় রোজই প্রশ্ন উঠছে। আমার বারবার মনে হয় এটা বন্ধ হওয়া দরকার। যাতে কলকাতাকে কেউ আনসেফ বলতে না পারে। নিজের শহরের দিকে কেউ আঙুল তুললে, কেউ খারাপ বললে খুব কষ্ট হয়। যেগুলো শহরকে কলুষিত করে সেগুলো নির্মূল করা প্রয়োজন।

কলকাতার কিছু কিছু জায়গায় আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্র সরোবর লেকের দিকেই তো আগে থাকতাম। জায়গাগুলোতে গেলে কত স্মৃতি মনে পড়ে যায়। এক-একসময় ভাবি এই শহর এমন একটা শহর হোক যেখানে চারিদিকে শুধু ভালোর আবেশ ছড়িয়ে থাকবে।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

‘প্লাস্টিক বর্জন করুন’

রামবল্লভ দাস

চিরকালই আমি খাদ্যরসিক। খিদে পেলে কিছু না খেলেই মুখ গোমরা হয়ে যায়। তাই বাসে উঠে খিদেটা ঠিকমতো পেতে না পেতেই কখন আনমনে ব্যাগের চেনটা টেনে চিপসের প্যাকেট থেকে চিপস বের করে খাচ্ছি আর মনের আনন্দে আকাশ-পাতাল ভাবছি। এই যেমন আমার কলিগদের কেউ কেউ মাছের ঝোল-ভাত একদম পছন্দই করে না। অথচ মাংসের কিমা তাদের ভীষণ পছন্দ। আবার কেউ কেউ মিষ্টিদই পছন্দ করে ঠিকই, তবে তাদের হাব-ভাবে মিষ্টতার লেশমাত্র নেই। অফিসের বস রোজ বাড়ি থেকে নিয়ম করে খাবার এনে খান। টিফিন আওয়ারে ভরদুপুরেও টক-ঝাল ফুচকা তার চাই। নইলে গোটা অফিসটাকে মাথায় করে রাখবেন। একথা মনে পড়তেই একফালি হাসি নেমে এল মুখে। হঠাৎই সে সুখচিন্তার ছেদ পড়ল। কারণ হাতের চিপস ফুরিয়ে গেছে। বাস শিয়ালদা ছাড়িয়ে রাজাবাজার পৌঁছেছে। ফলে চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে চিপসের ফাঁকা প্যাকেটটা ফেলে দিলাম।

একটু এগিয়ে সামনের সিগন্যালে বাসটা দাঁড়িয়েছে। বিকেলের আলো সবেমাত্র শহরের বুকে রং ছড়াচ্ছে। হঠাৎই একটা দৃশ্য চোখে পড়তে ভাবনা-চিন্তা সব কোথায় যেন উবে গেল। দেখলাম চার-পাঁচটা ছোট্ট ছেলে, রাস্তার পাশের পড়ে থাকা প্লাস্টিকগুলোকে জড়ো করে পাশের ডাস্টবিনটাতে ফেলছে। তার পাশেই আরও কয়েকটা ছেলে-মেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে, সবার একই রকম ড্রেস। যে-গেঞ্জিগুলো ওরা পরে আছে তার কোনওটার বুকে লেখা ‘গাছ আমাদের বন্ধু’ কোনওটায় ‘প্লাস্টিক বর্জন করুন’ আর প্ল্যাকার্ডগুলোতেও ওইরকম পরিবেশ সচেতনতামূলক কথা লেখা। আর প্রত্যেকের জামায় লেখা— ‘বন্ধুদের বাড়ি A Orphan Home’ দেখে বুঝলাম এরা সকলেই কোনও অনাথ আশ্রমের। কী একটা অপরাধবোধে বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল। আমাদের বাড়ি আছে সুস্থ-চিন্তার সমস্ত খোরাক আছে। তবু কিছু বদভ্যাসও আছে। নিজের বাসস্থান, শহর নিজেই

নোংরা করছি জেনে-শুনে! এ দৃশ্য তো এমন কিছু নয় তবু নিজের ভেতর কেমন একটা খারাপলাগা তৈরি হচ্ছিল।

বাস সিগন্যাল ছেড়ে অনেকটা চলে এসেছে কখন খেয়াল করিনি। সারাদিনের অফিসের শেষে ক্লান্তিতে একটু ঝিমোচ্ছিলাম। বাসের ঝাঁকুনিতে ঘোর কাটল। যথারীতি আরেকটা চিপসের প্যাকেট বের করে মচমচ করে আত্মসাৎ করতে শুরু করেছি। মিনিট সাতেকের মধ্যে সেটিও তথৈবচ। শেষ। অভ্যাসবশত হাত চলে গেল জানালার বাইরে। তবে প্যাকেটটা ফেলতে গিয়ে কোথাও একটা দ্বিধা কাজ করল, ফেললাম না। ওই ছেলেগুলোর মুখ আমার চোখে তখনও স্পষ্ট ভাসছে। আসলে দৈনন্দিন যাওয়া-আসার পথে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, যেগুলোকে আপাতভাবে ছোট মনে হলেও, অন্তরের অন্তস্থল নাড়িয়ে যায়।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
কলকাতা

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল

প্রিয় 'যুগশঙ্খ সাপ্লি'র পাঠক
আপনারা ওয়েবসাইটের 'রিডার্স কমেন্ট'-এ কিংবা ই-মেইলে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত লিখে জানাচ্ছেন। আমরা ভীষণ খুশি। আমরা আপনাদের মতামত থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছি এবং আপনাদের চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

আপনাদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, আপনারা যাঁরা 'সাপ্লি' সংক্রান্ত মতামত জানাচ্ছেন, তাঁরা দয়া করে তাঁদের ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানাবেন। কারণ, আমরা আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতে চাই। *(সাপ্লি টিম)*

খাবার-দাবার @ কলকাতা

বইপাড়ার রসনা

সৈকত ঘোষ

বসন্ত তো হপ্তা দু'য়েক আগেই বিদায় নিয়েছে। ঝরাপাতা সরিয়ে এনে দিয়েছে নতুন বছর। আমাদের শহরেও বদলে যাচ্ছে জীবনের রং। থার্মোমিটার বলছে পারদ চড়ছে কলকাতার। বেলা এগারোটার পর প্রত্যেকটা দিনকেই মনে হচ্ছে শহরের উষ্ণতম দিন। ভিড়-জ্যাম-ধোঁয়া থেকে মন চাইছে কিছুক্ষণের রিলিফ। আজকের ডেস্টিনেশন এমন একটা জায়গা যেখানে যেতে গেলে আপনাকে নতুন বইয়ের গন্ধ মেখে এগিয়ে যেতে হবে। কলকাতার শরীরে এ এক অন্য কলকাতা। কথারা কালো অক্ষর হয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে এখানে। ঠিক ধরেছেন, আমি কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার কথা বলছি।

ফেলু মিত্তির বা ব্যোমকেশ না হওয়া সত্ত্বেও আমি বিশেষভাবে লক্ষ করেছি ডাবের সাথে বাঙালির একটা অদ্ভুত ভাব রয়েছে। টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়েও যে কোনও নামী ব্র্যান্ডের কোল্ডড্রিংকসকে হেলায় ক্লিন বোল্ড করে দিতে পারে এই প্রাকৃতিক শরবত। কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতাটির নস্টালজিয়াকে উস্কে দিয়ে কচি ডাবের স্মার্ট ঝকঝকে সংস্করণ নিয়ে হাজির বইপাড়ার জনপ্রিয় শরবতের দোকান 'প্যারামাউন্ট'। সত্যি কথা বলতে কী প্যারামাউন্ট-এর এই স্পেশাল ডাবের শরবত না খেলে ১৬ আনার মধ্যে ১ আনা কলকাতার ফ্লেভার আপনি মিস করবেন। রাস্তার ধারে ডাব কেটে স্ট্র দিয়ে তো অনেক খেয়েছেন, কিন্তু এইভাবে একটা সুদৃশ্য লম্বা কাচের গ্লাসে ডাবের জল উইথ আইস প্যারামাউন্ট স্পেশাল মশলা অ্যান্ড কচি ডাবের মিষ্টি শাঁস— পুরো প্রেজেন্টেশনটা একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়। নিঃসন্দেহে এই শরবত আপনার শরীরকে ঠান্ডা করার সাথে সাথে মনকেও অদ্ভুত তৃপ্তি দেবে।

কথায় আছে, বাঙালি জীবন যতটা ক্রিসপি ততটাই মশলাদার। আর বইপাড়ার খাবারের কথা বললে প্রথমেই মনে আসে পুঁটিরামের হিং দেওয়া কচুরির সাথে ছোলার ডাল। এই অনবদ্য স্বাদ আপনাকে বার বার কলেজ স্ট্রিট চত্বরে টেনে আনার পক্ষে যথেষ্ট। এবার পেট পুজোর সাথে বাঙালির যেটা চাই তা হল আড্ডা। সিসিডি-বারিস্তার যুগেও কলকাতার বুকে আড্ডার একটা অন্য ফ্লেভার পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই একবার ঢুঁ মারতে হবে বইপাড়ার হেরিটেজ কফি হাউসে। কফি হাউস মানেই ইনফিউশন সাথে অনিয়ন পকোড়া। এই কালো কফির মধ্যেই আড্ডার একটা আলাদা গন্ধ আছে। আপনি যদি ননভেজ পছন্দ করেন তবে কোল্ড কফির সাথে চিকেন স্যান্ডউইচ ট্রাই করতে পারেন। দুপুরের আড্ডাটা মন্দ জমবে না। কলেজ স্ট্রিট চত্বরে পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে ফেভারিট কেবিন। এখানকার দুধ-চা, সাথে বাটার টোস্ট আপনার মুড ভালো করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সাথে এখানকার জমাটি আড্ডা তো থাকছেই। বাঙালি মানেই ঝালে ঝোলে ষোলো আনার জায়গায় পুরো আঠেরো আনা। সুতরাং খিদেটা একটু জোরালো হলে শতাব্দীপ্রাচীন বসন্ত কেবিনের বিখ্যাত কবিরাজি কাটলেট চেখে দেখতেই পারেন, স্বাদ অবশ্যই মনে দাগ কাটবে। আর শেষবেলায় একটু মিষ্টিমুখ না করলে কেমন হয়...যুগলসের নলেন গুড়ের সন্দেশ আপনার সেই ইচ্ছেও পূর্ণ করবে।

ফোটো: প্রলয় হাজরা

ব্যক্তিত্ব @ কলকাতা

রাজা রামমোহন রায়

শুভেচ্ছা প্রধান

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তারিণীদেবী বলছেন, 'ধর্মত্যাগী পুত্রের মস্তক যদি এখানে ছিন্ন করা হয়, তাহলে আমি পুণ্য কাজ বলে মনে করব' কিন্তু কেন? না ছেলে বিধর্মী, তাই পৈত্রিক সম্পত্তি যেন না পায় তার জন্যেই ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করলেন মা। কিন্তু সেই ছেলেটি প্রথমে মায়ের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে রাজি হননি। কী করে হবেন! মায়ের বিরুদ্ধে কি আইনি লড়াই চলে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও আইনি লড়াইটা কিন্তু তাও লড়তেই হল। কারণ, না হলে যে তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবে। তাই তিনি মামলা লড়েন এবং জিতেও যান। মামলায় জিতে তাঁর প্রাপ্ত সম্পত্তি তিনি ফিরিয়ে দিলেন তাঁর মাকে। কারণ তাঁর প্রতিবাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মায়ের বিরুদ্ধে নয়।

যুবকটি একেশ্বরবাদে বিশ্বাস থেকে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেও, তাঁর মা তারিণীদেবী ও বাবা রামকান্ত দুজনেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ। জীবনের শেষদিকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন এবং হরিনাম সংকীর্তন করে জীবনের বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করেন। যাঁর বাবা-মা জীবনভর ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হয়ে থেকেছেন তাঁদের সন্তান কিনা বিধর্মী! মানতে পারেননি বাবা-মা। তাই জল গড়ায় আদালত অবধি। কিন্তু কে এই যুবক? তিনি হলেন বাংলা নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ সালে যখন সারা ভারতে ফরাসি বিপ্লবের ঝড় বইছে, ঠিক তখনই, ২২ মে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে এক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল রাধানগর গ্রামে। পনেরো-ষোলো বছর বয়স থেকেই তিনি ঘর ছেড়ে নানাস্থানে ঘোরেন। কাশীতে ও পটনায় কিছুকাল ছিলেন এবং নেপালেও গিয়েছিলেন। বারাণসী থেকে প্রথাগত সংস্কৃত শিক্ষার পর তিনি পটনা থেকে আরবি ও পারসি ভাষা শেখেন। পরে তিনি ইংরেজি, গ্রিক ও হিব্রু ভাষাও শেখেন। প্রথমদিকে তিনি কলকাতায় মহাজনের কাছে কাজ করতে শুরু করেন। এরপর ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। এই সময় জন ডিগবির সঙ্গে তাঁর সখ্যতা জন্মায়। বেশ কিছুদিন ওঁর সাথে দেওয়ান হিসাবে কাজ করেছিলেন রংপুরে। ১৮১৫ সালে রামমোহন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে এসে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'কেনোপনিষদ', 'ঈশোপনিষদ', 'কঠোপনিষদ', 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ' ও 'মুণ্ডকোপনিষদ'। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর লেখার প্রতিবাদ দেখাতে লাগলেন। এইসব প্রতিবাদ কটূক্তিপূর্ণ এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন। রামমোহনও প্রতিবাদের প্রতিবাদ করলেন যুক্তি দিয়ে ও ভদ্রভাষায়।

একেশ্বরবাদের সমর্থনে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুহাহহিদিন', ফারসি ভাষায় লেখা। ভূমিকা অংশ আরবিতে। এরপর একেশ্বরবাদ (বা ব্রাহ্মবাদ) প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেদান্ত-সূত্র ও তার সমর্থক উপনিষদগুলি বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করতে থাকেন। তাঁর লেখা 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বর উপাসনার পথ দেখালেন 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করে। এই আত্মীয়সভাকেই পরে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম ও রূপ দেন। সাহেবদের বাংলা শেখানোর জন্য তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে ব্যাকরণ রচনা করেন। ঠিক ওই সময় সমাজের বুকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল নৃশংস সতীদাহ প্রথা। তাঁর রচিত বেদান্ত-উপনিষদগুলি প্রকাশ করবার সময়ই তিনি সতীদাহ অশাস্ত্রীয় এবং নীতিবিগর্হিত প্রমাণ করে লিখলেন 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। এর প্রতিবাদে পুস্তিকা বের হল 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। একে একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়। নিষিদ্ধ হয় সহমরণ রীতি। ধর্মগোঁড়া মানুষজন চেষ্টা করতে লাগল পার্লামেন্টে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য। তিনি বিলেত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর তিনি কলকাতা থেকে বিলেত যাত্রা করেন। দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছলেন। সেখানে সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বৎসমাজে তাঁর প্রচুর সমাদর হয়েছিল। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে কিছুদিনের জন্য তিনি ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন। রামমোহন ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করে বুঝতে পারলেন, দেশের মানুষের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার, জাতীয় চেতনার প্রসার, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা। এ কাজে সবচেয়ে বড় সহায়ক সংবাদপত্র। ইতিমধ্যে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তারই অনুসরণে ১৮২২ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশ করলেন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী'। এতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে দেশের বিষয়ের পাশাপাশি দেশের মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হতো। প্রকৃতপক্ষে 'সংবাদ কৌমুদী' বাংলার প্রথম সংবাদপত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন— 'সত্যকে স্বীকার করে রামমোহন দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন, সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট।'

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২২ মে ২০১৭

নৈঃশব্দ্যের চূড়া

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

সে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সেটা ১৯৭৯ বা ৮০ সাল হবে। সেইসময় আমরা নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে জনবিরল রাস্তার ওপর একটা বাড়িতে উঠে এলাম। তখন সবে বিয়ে করেছি। শরীরে মনে অনেক স্ফূর্তি। তবে নিজেদের আস্তানা ছেড়ে নতুন বাড়িতে যাওয়াটা ছিল বেশ আকস্মিক। তখন আমাদের হাতে টাকা-পয়সা ছিল খুব কম। তরুণের মানে আমার বরের বাড়িতে ওর অনেক ভাইবোন; থাকবার জায়গার অভাব। আমার বাবা-মায়ের বাড়িতেই আমরা থাকতাম ফলে আমাদের বাড়িভাড়ার খরচ বেঁচে যেত এবং বাসস্থান নিয়ে আমাদের বড় কোনও অসুবিধেও তৈরি হয়নি। এরমধ্যে তরুণের একজন বন্ধুকে হঠাৎ বিদেশে বদলি হতে হল চাকরির সূত্রে। সেই বন্ধুর একটা ছোট বাড়ি ছিল বেলেঘাটায়। একেবারে রাস্তার ওপর। সেই বন্ধু এক বছরের জন্যে বিদেশ চলে গেলেন। তাঁর বাড়িটা খুব ছোট কিন্তু খুব সাজানো। সেখানে ছিল টিভি, রেফ্রিজারেটার, দামি দামি মূর্তি। টিভি ফ্রিজ তখন কলকাতার মধ্যবিত্ত বাড়িতে প্রায় চোখেই পড়ত না। কিন্তু তরুণের সেই বন্ধুকে তো চলে যেতে হবে বাড়িতে চাবি দিয়ে। এদিকে কলকাতায় তখন প্রতিদিন লোডশেডিং হয়। অন্ধকারে চোর বেরোয় খুব। তরুণকে তাই তার বন্ধু প্রস্তাব দিলেন যে তরুণ যদি এক বছরের জন্যে ওই বাড়িটাতে থাকে তাহলে তিনি নিশ্চিন্তে বিদেশে যেতে পারেন। আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে তরুণের স্পেসের অভাব হচ্ছিল হয়তো। তরুণ আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল ওর বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্যে। আমার বাবা-মা আপত্তি করলেন। তরুণের বাড়ির লোকজনও বললেন যে তেমন হলে ওদের ছোট ঘরেও আমরা যেন গিয়ে থাকি কিন্তু কারুর বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে এইভাবে কোথাও উঠে যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া জায়গাটা খুব ফাঁকা। এমন একটা জনবিরল জায়গায় আমরা থাকতে চাই শুনে দুই বাড়ির লোকজন বেশ চিন্তিত হয়ে রইলেন। কিন্তু তরুণ জেদ ধরে থাকল। নানা যুক্তি-তর্ক, লড়াই ঝগড়ার পর আমরা কিছুদিনের জন্যে উঠে গেলাম তরুণের বন্ধুর ছোট ছিমছাম সেই বাড়িতে। কলকাতায় প্রোমোটারি শিল্প তখন সদ্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তরুণের বন্ধু ওকে বলেছেন তাঁর এই বাড়িটাও প্রোমোটারকে বেচাবার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু তিনি নাকি ঠিক দর পাচ্ছেন না। বাড়িটায় প্রথম ঢুকে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগল। শুধু ফ্রিজ বা টিভি নয়। বাড়ির একটা ঘরে রয়েছে এয়ার কন্ডিশনার। সেই এসি খুলে দিলেই ঘরটা কনকনে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তখন কলকাতায় মধ্যবিত্ত বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনার থাকবে এটা কল্পনাও করা যেত না! যে কোনও আরাম আয়েশ প্রথম প্রথম আমার বেশ ভালোই লাগে। আমি নতুন চাদর, বালিশের কভার কিনে বাড়িটা গোছগাছ করতে শুরু করলাম। দোতলা বাড়ি। একতলায় রান্নাঘর আর একটা ঘর। দোতলায় দুটো ঘর। একটা ঘরের সঙ্গে বাথরুম। তখনও ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুমের চল খুব বেশি শুরু হয়নি এই শহরে। বাড়িটা বেশ পছন্দ হয়ে গেল। দোতলার ঘর থেকে সামনে একটা ফাঁকা রাস্তা দেখা যায়। জায়গাটায় প্রচুর গাছপালা। তরুণের তখন যে চাকরি তাতে ভারতের বিভিন্ন শহরে ওকে ঘুরে বেড়াতে হয়। তখন বাড়িতে আমি একেবারে একা। সে একা থাকতে কোনওদিনই আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মনে পড়ে দিনটা ছিল রবিবার। বাড়ির সামনের রাস্তাটা একেবারে শুনশান। দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে দেখছিলাম রাস্তায় মানুষজন নেই। একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখলাম সামনের রাস্তাটা অজস্র শকুনে ভরে গিয়েছে। টলোমলো পায়ে হেঁটে শকুনগুলো এগোচ্ছে। এত শকুন আছে এখানে? কাছাকাছি কি কোনও ভাগাড় বা মৃত পশুপাখি ফেলবার জায়গা আছে নাকি? শকুন অতি নিরীহ প্রাণী। কারুর কোনও ক্ষতি করতে পারে না। কোনও প্রাণীর শরীরে এতটুকু প্রাণ থাকলে শকুন তাকে খায় না। মরা পশুপাখি মানুষের মৃতদেহ ওদের খাদ্য। এই এলাকায় তার মানে ওদের কোনও খাবার সংস্থান আছে! জানলা বন্ধ করে এসি চালাব ভাবছি এমন সময় একটা শকুন চিঁ হিঁহিঁহিঁ করে জানলার ওপরের কার্নিশে এসে বসল। একটু চমকে গেলাম। ভাবলাম বেচারির বুঝি খিদে পেয়েছে। এদিকে বাড়িতে তো মাংস জাতীয় কিছুই নেই। তবে মাছ আছে ফ্রিজে। শকুনে কি মাছ খায়? এইসব ভাবছি; এমন সময় টুপ করে সাদা মতো কী একটা ছোট জিনিস কার্নিশ থেকে জানলা গলে ঘরের মধ্যে পড়ল। জানলার সঙ্গে লাগোয়া একটা চেয়ার ছিল। চেয়ারটায় আমি বসেছিলাম। চেয়ারের হাতলের ওপর ছিটকে পড়ে চেয়ারের তলায় জিনিসটা চলে গেল। আর চেয়ারের হাতলে লেগে রইল কয়েক ফোঁটা রক্ত। আমি আঁতকে উঠলাম। শকুনটা কি মরা ইঁদুর ধরে জানলার ওপর বসেছিল নাকি? না হলে রক্ত কোথা থেকে আসবে? নিচু হয়ে চেয়ারের তলায় দেখলাম একটা লম্বা আঙুল। সেই আঙুলের নখে টকটকে লাল নেল পালিশ। আঙুলের একটা দিক খুবলে খাওয়া। শিউরে উঠলাম। ইঁদুর নয় মানুষের শরীরের অংশ, শকুনের মুখ থেকে ঘরে এসে পড়েছে। কিন্তু মানুষের মৃতদেহ শকুন পেল কোথায়?

আঙুলটা আমি সরাব কী করে? নিজে তুলব? দিশেহারা লাগল। জানলার কার্নিশের ওপর শকুনটা বসে বসে তখনও কিছু একটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তার মানে যার আঙুল আমার ঘরে পড়েছে সেই মৃতদেহের অংশ খাচ্ছে নিশ্চিত। জানলাটা চটপট বন্ধ করে দিলাম। আঙুলটা পড়ে রইল ঘরের মধ্যে। কাছাকাছি কি কোনও কবরস্থান আছে? কিন্তু কবর থেকে তো শকুন মৃতদেহ খেতে পারবে না। তাহলে কি কাছাকাছি কোথাও কেউ মরে পড়ে আছে? কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ মরে পড়ে থাকলে তো শকুন ঢুকতে পারবে না। আর রাস্তায় পড়ে কেউ মারা গেলে তো অনেক লোক জমে যাবে! একমাত্র পারসিকরা যেখানে আত্মীয় প্রিয়জনের অন্তিম সংস্কার করেন সেই টাওয়ার অব সাইলেন্স থেকে শকুনেরা খুব সহজে মানুষের মৃতদেহ খেতে পারে। পারসিকরা যেখানে প্রিয়জনের মৃতদেহ রেখে আসে উঁচু স্তম্ভের পাঁচিলে। যাতে অভুক্ত জীব সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করে খিদে মেটাতে পারে। পারসিকদের এই দর্শনটা আমার চিরকালের প্রিয় ছিল। মৃত্যুর পর জীর্ণ বসনের মতো এই নশ্বর শরীর আর কোনও কাজে লাগে না। ফলে সেই শরীর দিয়ে যদি অনেক অভুক্ত প্রাণী খিদে মেটাতে পারে তাহলে সেটা তো নিশ্চিত খুব বড় কাজ। অভুক্তকে খাবার দেওয়া তো ছোটকথা হতে পারে না। মঙ্গোলিয়ায় একটি উপজাতি আছে ; তাঁরাও প্রিয়জনের মৃতদেহ কুকুরদের খাওয়ার জন্য উৎসর্গ করেন। শুনতে প্রাথমিকভাবে একটু অস্বস্তি হতে পারে কিন্তু ভেবে দেখলে কাজটার ভিতর একটা গভীর মহত্ত্ব, প্রকৃতির প্রতি একটা সুনিবিড় করুণা অনুভব করা যায়।

কিন্তু আমার ঘরে আঙুলটা এল কোথা থেকে? আশেপাশে কি তাহলে পার্সিদের অন্তিম সংস্কার হয় নাকি?

দুপুর বিকেলের দিকে গড়াচ্ছিল। আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম। কিছু দূরের বাজার থেকে কিছু ফল-সবজি কেনবারও দরকার ছিল। রাস্তার ওপর তখনও বেশ কয়েকটা শকুন বসে রয়েছে। কয়েক পা এগিয়ে একটা পানের দোকান থেকে পান কিনলাম। পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, এদিকে এত শকুন দেখা যায়? আশেপাশে কোনও ভাগাড় আছে নাকি? পানওয়ালা পাতায় খয়ের পিষলেন। নেহি, উয়ো পার্সি লোগ হ্যাঁয় না, উয়ো লোগ ডেডবডি ফেক যাতা হ্যাঁয় পাঞ্ছিকে লিয়ে। ডর লাগ যাতা হ্যাঁয় কভি কভি। রাম রাম।

ও। তার মানে ধারে কাছে পার্সিদের অন্তিম সংস্কার হয়। পারসিকদের টাওয়ার অব সাইলেন্স রয়েছে খুব কাছে কোথাও। আমি পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁহা হ্যাঁয় ভাইয়া? পার্সিলোগ ডেডবডি লেকে কাঁহা যাতা হ্যাঁয়? পানওয়ালা যা বললেন সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমরা যে গাছপালা ঘেরা বাড়িতে থাকছি ঠিক তার পিছনেই বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে টাওয়ার অব সাইলেন্স। পারসিকরা যেখানে মৃতদেহ রেখে যায় পাখিদের খাওয়ার জন্যে।

লোহার জং ধরা গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। জায়গাটা এয়ার কন্ডিশন করা ঘরের মতন ঠান্ডা। চারপাশে গুরুজনদের মতো দাঁড়িয়ে প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, তেঁতুল, নিম। গাছের ছায়ায় ঘেরা জায়গাটা দিনের আলোতেও কিছুটা অন্ধকার। কিন্তু এতবড় জায়গায় কোনও জনমানব নেই! একটা বিরাট গম্বুজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গম্বুজেরর ওপরে বসে থাকা শকুনগুলোকে বিন্দুর মতো লাগছে নীচে থেকে। এই হল পার্সি টাওয়ার অব সাইলেন্স। কলকাতার বুকে জেন্দ-আবেস্তার কয়েকটা পাতা।

কিন্তু এখানে কোনও মানুষ নেই কেন? দরোয়ান বা যাঁরা অন্তিম সংস্কারে সাহায্য করেন তাঁদের তো থাকা উচিত ছিল এখানে। আসলে দিনে দিনে পারসিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতেই। কলকাতা ছেড়ে অনেক পার্সি চলে যাচ্ছেন। তাছাড়া অনেক পার্সি আবার এখন টাওয়ার অব সাইলেন্সে সৎকারের বদলে দেহ কবর দেওয়া বা দাহ করার পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন। সেইজন্য নিশ্চয় এই টাওয়ার অব সাইলেন্সে চিল শকুনের ছিঁড়ে খাবার জন্য মানবশরীর পড়ে থাকে খুব কম। মাঝেমাঝে মৃতদেহ রেখে যে যার মতো চলে যায়। জায়গাটা ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণ করবার কেউ নেই।

কিন্তু আজ বা গতকাল এখানে কোনও মৃতদেহ এসেছে আমি জানি। একটা সাদা আঙুল আজ শকুন এনে ফেলেছে আমার ঘরে।

সকালে হয়তো এখানে কারুর অন্তিম সংস্কার হয়েছে। এখন বিকেলে আবার সব ফাঁকা নিঃশব্দ।

একটা জাম গাছে অজস্র জাম ধরে রয়েছে। তবে ওপরের ডালগুলোতে। নীচের ডালগুলো ফাঁকা। লোকে পেড়ে নিয়ে গিয়েছে। গাছটার নীচে তবে অনেক জাম পড়ে রয়েছে। কেউ কুড়োয়নি। সহজে যা পাওয়া যায় সেদিকে সহজে মানুষ তাকায় না। কয়েকটা জাম কুড়োচ্ছি এমন সময় পিঠে একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে পিছনে ফিরলাম।

মাথা ঢাকা; ফর্সা; অতীব সুন্দরী এক মহিলা। ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিপস্টিক। গোলাপি দুটি হাতে লাল নেল পালিশ। তখন কলকাতার বাঙালি মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত লিপস্টিক, নেল পালিশের চল শুরু হয়নি। কী অন্যরকম সুন্দর দেখতে মহিলাকে!

মহিলা আমাকে ভাঙা বাংলায় বললেন, এখানে কী করছ? হঠাৎ কেন এলে এই টাওয়ার অব সাইলেন্সে? তবে এসেই যখন পড়েছ তখন টাওয়ারের ভেতরে ঢুকে দেখবে না? ভেতরে ঢুকলে দেখবে কী শান্তি। মরবার পরে আমাদের এই নশ্বর শরীরটা অসহায় পাখিদের খিদে মেটায়। আমাদের আত্মা আকাশ

থেকে সেই সুন্দর দৃশ্য দেখে আনন্দে হাসে। আবেস্তায় বলেছে পারসিকদের জীবনের শেষ ত্যাগ হচ্ছে আমাদের নিজেদের মৃতদেহ দিয়ে ক্ষুধার্ত প্রাণীদের পেট ভরানো। সেইজন্য জানো তো মৃত্যু আমাদের কাছে চমৎকার অর্থবহ এক অভিজ্ঞতা। আমি বাক্যহীন হয়ে মহিলার কথা শুনছিলাম।

মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই শান্তির গম্বুজের ভেতরে ঢুকতে চাও? আমি বললাম, আপনি কে? আপনি কি পারসিক? আপনিই-বা এখানে কী করছেন?

মহিলা ঠান্ডা হাসলেন। হ্যাঁ আমি পারসিক। জেন্দ আর আবেস্তা দুটি বই আমার জীবন-মরণ। ইহকাল পরকাল। দ্য টু বুকস আর মাই অল। এই জেন্দ-আবেস্তা বলে, মৃত্যুর পর আমাদের পুরো শরীরের প্রতিটি কোষ, যতক্ষণ না কোনও ক্ষুধার্ত প্রাণী খেয়ে ফেলছে ততক্ষণ আমাদের মুক্তি হয় না। যদি শরীরের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোনওভাবে চিল, শকুন বা অন্য কোনও প্রাণী খেতে না পারে তাহলে আমাদের ধর্মমতে আমাদের অন্তিম সংস্কার সম্পূর্ণ হয় না। আমার নাম ইশতার। নাইস টু মিট ইউ। ইশতার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সেই হাত ধরে মনে হল যেন ঠান্ডা বরফ ছুঁয়েছি। বললাম, তোমার হাত এত ঠান্ডা কেন? তুমি কি অসুস্থ? ইশতার বলল। নো ডিয়ার। আই অ্যাম

এরপর সাতের পাতায়

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২২ মে ২০১৭

তরুণ বাঙালি ঈর্ষায় ডুবে রয়েছে?

অভিমুন্য রায়

সবাই দৌড়চ্ছে। রুদ্ধশ্বাসে। কেউ নিজের জীবন হাতে নিয়ে। কেউ অন্যের জীবন কেড়ে নিয়ে। দৌড়চ্ছে সবাই। আমরা সবাই লাইনে দাঁড়াই। এক, দুই, তিন। প্রথম তিনজনের মধ্যে যত লড়াই। বাকিরা চেয়ে দেখেন। তিন চেষ্টা করে দুইকে টেক্কা দেওয়ার। দুই এককে। এক পেছনে এলে হিংসে করে। সবাই পেছনে তাকিয়ে ভাবেন অজগর তেড়ে আসছে। এবার আমটা খেল বলে। তার আগে যদি আমটা খেয়ে নেওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি, ভয় হয় ইঁদুর ছানার। আমরা মনের মধ্যে অজানা হিংসের জন্ম দিয়ে ফেলি। কিন্তু এটা ভাবি না যে আমের দিকে তেড়ে আসা, আর আম পেড়ে খাওয়া— দুটো একেবারে আলাদা। যে তিন নম্বরে থাকে তার সব থেকে বেশি ভয়। তার একটা কথাই মাথায় ঘোরে। এই বুঝি ঈগল পাছে ধরে ফেলল! নীচে যারা রয়েছে তারা প্রতিযোগী থেকেই রয়ে যায় সারা জীবন। তাদের মনে রাগ সবথেকে বেশি। না পাওয়ার রাগ। হিংসা সেখান থেকেই জন্মায়।

রেস তো আমাদের বাড়ি থেকে শুরু হয়। হিংসেও বলতে পারেন। বাবা-মায়েরাই ঘুষ নিতে শেখায়। বলে ফার্স্ট হলে এই পাবে...না হলে পাবে না। পাশের বাড়ির ছেলেটার কাছে যদি সেটা থাকে, তা হলে ছোট থেকেই রাগ। হিংসে করতে শিখি। আলু-পটলের ইংরেজি বই দেখে শিখতে হয়। যদি সত্যি আলু দেখিয়ে কেউ তার ইংরেজি বলে দেয়, তা হলে বাচ্চারা হয়তো ভুলবে না। জয় গোস্বামীর 'টিউটোরিয়াল' কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন গল্পটা। নব্বইয়ের বদলে পঁচাশি পাওয়া ছেলেটিকে বাবা যখন ভর্ৎসনা করছে, কাগজের একদম প্রথম পাতায় থাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছে, তখন ব্যাক পাওয়া ছেলেটি বাথরুম পরিষ্কারের অ্যাসিড হাতে তুলে নেয় কাগজের প্রথম পাতায় ঠাঁই পেতে।

মাধ্যমিক শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক। প্রতি বছর এই মরসুমে খবরের কাগজের পাতায় যে অবশ্যম্ভাবী আত্মহত্যার খবরগুলো উঠে আসে, সেগুলিতে জয়ের কবিতার ওই ছেলেটির মতো চরিত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। তারা হল ইঁদুরছানার দলে। কিন্তু ওই যাদের আমটি পেড়ে খেতে শিখতে হয়, নির্বিঘ্নে তেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা যাদের নেই প্রথম স্থানাধিকারী অজগরের মতো? মধ্যবিত্ত ক্রাইসিস-আক্রান্ত সমাজমানসে তারা চিরন্তন মিডিওকার। এই 'মিডিওকার' শব্দটি মধ্যবিত্তের কাছে অতিপরিচিত লবজ। হচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা। তারাই ওই আমটি শেষমেষ পেড়ে এনে দেবে তার কাছের লোকজনদের কাছে। এইভাবেই তাদের আশা মেটাবে তারা। কিন্তু এই ম্যারাথন দৌড়ের ফাঁকেই ওই প্রথম আর দ্বিতীয়র মধ্যে যে অন্তঃসলিলা স্রোত বয়ে চলেছে চুপিচুপি, কোনও প্রত্যক্ষদর্শীকে সাক্ষী না রেখেই, সেই স্রোতটির নাম ঈর্ষা।

ঈর্ষা আদিম। ফ্রয়েড কথিত ঈদিপাস কমপ্লেক্সের ফলের বীজ। কিন্তু এই বিশেষ পরিসরটিতে ঈর্ষার আদানপ্রদান অদ্ভুত। আমরা মাধ্যমিকে 'মালগুড়ি ডেজ'-এর একটি গল্প পড়েছিলাম, যেখানে ক্লাসের নবাগত ছাত্র ক্লাসের সমস্ত জৌলুস কেড়ে নিচ্ছিল প্রোটাগনিস্ট স্বামীনাথনের থেকে। সিংহাসনচ্যুত হওয়ার মতো ব্যাপার। কাজেই নানান ঘাত-প্রতিঘাতের পরে অবশেষে ইজ্জত বাঁচাতে স্বামীনাথন সেই নবাগতটিকে মেরে পঙ্গু করে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষমেষ মিটমাট হয়ে যায় সব। মধুরেণ সমাপয়েৎ। কিন্তু এই মারামারি-কাটাকাটির মধ্যে না গিয়েও প্রথম এবং দ্বিতীয়ের মধ্যে, স্বীকৃত জিনিয়াস এবং মার্কামারা মিডিওকারদের মধ্যে সংঘর্ষের অন্ত নেই। সেইসব ঘটনা ক্বচিৎ কদাচিৎ সরাসরি খুনোখুনির চেহারা নিলে তবেই মিডিয়ার সার্চলাইট পড়ে সেই এলাকাতে। কিন্তু সেই ভয়াবহতায় পৌঁছনোর আগের চোরাস্রোতের খবর ক'জন রাখে? আর সমাজের আর্থ-সামাজিক পিরামিডের একদম ওপরতলা আর একেবারে নীচের তলা; এই দুই জায়গাতেই দাহ্যবস্তু থেকে সরাসরি বিস্ফোরণ হয়। বাদবাকি জায়গায় আগুন থাকে ছাইচাপা।

ইংলিশ মিডিয়াম হোক বা বাংলা মিডিয়াম, একচিলতে নম্বরের জন্য শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, অভিভাবকরা মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেন— এ ঘটনা মোটেই বিরল নয়। কী করে অমুক ওই সাবজেক্টে একশোয় বিরানব্বই পেল— এ প্রশ্ন যিনি করলেন, দেখা যাবে ওই সাবজেক্টটিতে তাঁর ছেলের প্রাপ্ত নম্বর হয়তো একানব্বই। এবার ষাট-সত্তরে আটকে থাকা জনগণের কী হবে? আঙুর ফল টক ভেবে নিলেই তাদের সমস্যা মিটে যেত। ষাট-সত্তর পেয়েই-বা জীবনের কী এমন ক্ষতি হয়? কিন্তু মা-বাবা-ফুলপিসিমা-ন'জ্যাঠাদের কল্যাণে এমনটা ভাবার জো নেই। পাখির চোখ সেই নব্বইয়ের ঘরে আটকে। ফলে তাদের ভেতর জারিত হয় ঈর্ষা। ষাট আর সত্তরের দশকের মতই অশান্ত হয়ে থাকে তাদের এই ষাট-সত্তরের ঘরে আটকে থাকা ছাত্রছাত্রীদের অন্তস্তল। টেস্টপেপারের পাতায় মুখ গুঁজে থেকে তারা একবারও আনমনা হতে পারে না ভয়ে। যদি ফস্কে যায়? বিশ্বায়িত পড়াশোনা পরীক্ষা ব্যবস্থাতে কাজেই ঈর্ষা সর্বত্র চ্যাম্পিয়ন।

কর্পোরেট উচ্চবিত্ত বিলাসবৈভব ঝোলানো খুড়োর কলের পিছনে ছোটানোর জন্য উপযুক্ত ঘোড়া

ফোটো: প্রীতম চক্রবর্তী

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২২ মে ২০১৭

আমোদ-প্রমোদ

ঝুমা দাস মল্লিক

১৮৬০ সাল। শোভাবাজার। রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে রাতভর অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত অনেকের মধ্যে আছেন রেভারেন্ড ওয়ার্ড। তাঁর একটি বর্ণনায় বলেছেন— সুসজ্জিতা বাইজির নিদ্রাতুর পদক্ষেপে ভোররাতে নাচ শেষ হল। ইংরেজ অতিথিদের বিদায়ের পর খুলে গেল সদর দরজা। পিলপিল করে সাধারণ মানুষ অঙ্গনে ঢুকে পড়ল কবিগান শুনতে। সেই কবিগানের শিল্পী ও শ্রোতা উভয়কেই সাহেবের দৃষ্টিতে রুচিহীন মনে হয়েছিল। অষ্টাদশ থেকে উনিশ শতকের কলকাতার প্রমোদবিলাসের ধারা এভাবেই দু'টি ধারায় বয়ে চলেছিল।

সেযুগের কলকাতা বেড়ে উঠছিল দু'টি ধারায়— White Town এবং Black Town। লালদিঘিকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠছিল সাহেবদের White Town। ইংরেজ তাদের নিজেদের পরিসর গুছিয়ে নিয়ে বসছিল White Town-এ। তাদের নিজস্ব আমোদ-প্রমোদের ভুবনও গড়ে উঠছিল সেখানে।

১৬৯৫ সাল। জনৈক স্যামুয়েল একটি মদের দোকান খোলার অনুমতি পেলেন। কোম্পানি তখনও তাদের কলকাতা শহর তৈরি করে উঠতে পারেনি। তারপর ১৭৫৭ সাল নাগাদ শুরু হয় বিদেশি মদের আমদানি। বর্তমান লালবাজারের কাছেই ছিল ওইসব মদের দোকান। সেন্ট জনস গির্জার কাছে ইউনিয়ন ও রাইট-এর পানশালা। ডেকারস লেনে মুরের পানশালা। ১৮৮৬ সালে ভারতেই বিদেশি মদ প্রস্তুতের কোম্পানি তৈরি হল। রবার্ট গার্ডেন শ' এবং চার্লস উইলিয়াম ওয়ালস নির্মাণ করলেন Shaw-Wallace কোম্পানি। ১৮৮২ সালে নির্মিত হল Chhota Bristol Bar। এখানে আনাগোনা ছিল কলকাতার বাবুদেরও।

এই প্রমোদের পাশাপাশি আর একটি প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন। দেশ থেকে সদ্য আগত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাদের সাময়িক বাসস্থানের অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ করলেন মিস্টার স্পেনস্ নামক এক সাহেব। ১৮৩০ সালে গভর্নমেন্ট হাউসের উত্তর দিকে খোলা হল স্পেন্সেস হোটেল। হোটেলটি ছিল অতি বিলাসবহুল। ১৮৪১ সালের একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, স্নানঘরসহ একটি ঘরের ভাড়া মাসে ৩০০ টাকা। অতিরিক্ত একটি ঘর আরও ১৫০ টাকা। একজন অতিথির জন্য ২০ টাকা অতিরিক্ত প্রতিদিন। সেকালের হিসাবমতো যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এই হোটেলটি আজ আর নেই। তবে হোটেলটি আরেকটি কারণে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৭ সালে বিলেতফেরত ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসুদন দত্ত এখানেই এসে উঠেছিলেন। এমনকী এখানেই চেম্বার খোলেন। একার জন্যই তিনি তিনটি ঘর ভাড়া করেছিলেন। বন্ধুবান্ধবরা এলে অকাতরে বিলোতেন খাদ্য ও পানীয়। ফলে এই হোটেলে তাঁর প্রচুর ঋণ হয়। সে-যুগে একমাত্র ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ ছাড়া আর কোনও বাঙালিরই এখানে চেম্বার ছিল না। হোটেলটি পুরোটাই ছিল শ্বেতাঙ্গদের জন্য এবং শ্বেতাঙ্গ নির্মিত। এর পাশাপাশি ১৮৪১ সালে খুলল ডেভিড উইলসন সাহেবের হোটেল— যার পরবর্তী নাম গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। এখানে মোট ১০০টি ঘর। ১৮৮৩ সালে এখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে।

ইংরেজদের বিনোদনের নিজস্ব আরেকটি মাধ্যম ছিল থিয়েটার। ১৭৭৬ সালে ক্যালকাটা থিয়েটার স্থাপিত হয়। স্থান ক্লাইভ রো। ১৮১৩ সালে থিয়েটার রোডে খোলা হয় চৌরঙ্গি থিয়েটার। এটির পুনঃসংস্কার হয় ১৮৩৩ সালে। ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাঁ স্যুসি থিয়েটার। ইংরেজদের আর একটি প্রিয় প্রমোদ ছিল শিকার। ব্যারাকপুর কিংবা প্রথম যুগের মঙ্গলাকীর্ণ চৌরঙ্গি ছিল তাদের অতি কাছাকাছি অবস্থিত একটি মৃগয়াভূমি।

বাইজি নাচের প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের লেখা শুরু হয়েছিল। উত্তর ভারতীয় এই বাইনাচ সেকালের কলকাতার একটি জনপ্রিয় প্রমোদ মাধ্যম। সাধারণত দেশি বাবুদের গৃহে বাইনাচের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকতেন সাহেবরা। পতনোন্মুখ মোঘল দরবারের স্মৃতি নিয়ে এই বাইনাচ ছিল অভিজাত ধনীদের আশীর্বাদপুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা এই বাইনাচের নিন্দা করতে পারেনি। কিন্তু এর পাশাপাশি আর একটি লোকায়ত নৃত্যধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাবুরা। খেমটা— চন্দননগর, চুঁচুড়া থেকে যাত্রায় খেমটা নাচের প্রচলন হয়। কেশে ধোপী, গোপাল উড়ে প্রমুখ জনপ্রিয় যাত্রাওয়ালারা পালাতে খেমটার ব্যবহার করতেন। তবে এর দর্শক ছিল সাধারণ জনগণ— Black Town কলকাতার বাসিন্দা। বাইনাচের মতো ইউরোপীয় পর্যটকের তুলির টানে ধন্য হয়নি খেমটাওয়ালিরা। তাদের ছবি পাওয়া যাবে বটতলার চিত্রে।

Black Town তখন নানা প্রমোদে মত্ত। কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফআখড়াই, সং, ঢপকীর্তন, পায়রা-বুলবুলির লড়াই, ঘুড়ির টান- বিবিধ ও বিচিত্র সেই উপাদান। এছাড়া গাঁজা বা মদ বা আফিমের নেশা তো ছিলই। বাগবাজারে পক্ষীর দল বা শিবচন্দ্র মুখুজ্জের গাঁজার আড্ডা ছিল অতি পরিচিত। গড়ে উঠেছিল খালাসিটোলা বা বারদুয়ারির মতো সাধারণ মানুষের জন্য নেশার ঠেক।

বারবনিতা বিলাস ছিল সেই কলকাতার হঠাৎ বাবুদের চূড়ান্ত শৌখিনতার প্রকাশ। সেকালের সরকারি রিপোর্ট অনুসারে, ১৮৫৩ সালে কলকাতায় বারবণিতা ছিল ১২,৪১৯। ১৮৬৭ সালে সেই সংখ্যাটা হয় ৩০,০০০। বোঝা যায় হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছিল পতিতার সংখ্যা। কুলিন কুমারী ও বধূ, বালবিধবা বা ঘর থেকে ফুসলিয়ে আনা মেয়েদেরই এপথে যেতে বাধ্য করা হতো। চিৎপুর, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, বাগবাজার, সোনাগাছি, মানিকতলা স্ট্রিট অঞ্চলগুলি ছিল এদের বাসস্থান। ধনী বাবুদের বাঁধা রক্ষিতাদের আর্থিক কষ্ট না থাকলেও সাধারণদের অবস্থা ছিল অতি করুণ। খোলার ঘর, বস্তি, পাকাবাড়ি— নানাধরনের বাসস্থান ছিল এদের, বাড়িওয়ালি মাসির তত্ত্বাবধানে থাকা খাওয়ার ভাড়া যেমন গুনতে হতো তেমনই ছিল মাসির উৎপাত। এছাড়া পুলিশি উৎপাত তো ছিলই। ইংরেজদের প্রতি ক্যান্টনমেন্টে ছিল লালবাজার বা রেড লাইট এরিয়া। মার্চ করা বাহিনীর পিছনে পিছনে চলতো এই লালবাজার সাধারণ সৈনিকের শরীর মন সতেজ করার চলমান ব্যবস্থা। তবে সেনারা অসাবধানতা বশত যৌনরোগের শিকার হতে পারে। তাই ১৮৬৮ সালে প্রচলন হল 'কন্টাজিয়াস ডিজিস অ্যাক্ট' ও 'লক হসপিটাল'। এই আইনকে সাধারণ মানুষ বলত চোদ্দ আইন'। যৌনপল্লিগুলিতে এক জামিনের নামে ধরপাকড় শুরু হল। 'লক হসপিটাল' অর্থাৎ সন্দেহজনক মেয়েদের তুলে এনে চিকিৎসার নামে নতুন উৎপাত। যারা নিজের শরীর বেচে তাদের আবার কথা কী! পিউরিটান এই মনোভাবের চূড়ান্ত শিকার ওই মেয়েরা। এই আইনের প্রভাবে তাদের ব্যবসা মার খায়। অনেকেই কলকাতা ছেড়ে পালায়। ১৮৮৮ সালে রদ হয় এই আইন। এই সমস্ত বারবনিতাদের অনেকেই ছিল সংগীত বিদ্যায় পটু। রাজা রামমোহনের কল্যাণে ততদিনে কালোয়াতি গানের কদর বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আমরা বলতে চাইছি এই রূপোপজীবিনীদের অনেকের মধ্যেই গুণের সমাহার ঘটেছিল।

ব্ল্যাক টাউনের বাসিন্দা বাবুদের আর এক শখ ছিল শখের নাট্যদল গঠন। এই পথে হেঁটেই আমরা পেয়ে যাব বাংলা নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। সেকেলে কলকাতার নানাবিধ শখের কিছুমাত্র এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করে গেল। সেকেলে কলকাতার হোয়াইট টাউন যেভাবে ব্ল্যাক টাউনের ভিতর ঢুকে পড়েছিল, সেভাবেই ব্ল্যাক টাউনও হোয়াইট টাউনের অনুসারী হয়েছিল। বাঙালির নাটকের প্রতি আগ্রহ ও শখের নাট্যদল গঠন এসবের পিছনে তো ছিল ইংরেজি নাট্যশালার প্রতি বাঙালির আগ্রহ। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সযত্নে টাউন ভাগ করেছিল। কিন্তু পাশাপাশি চলতে গিয়ে হয়েছে আদানপ্রদান। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জাতীয় চেতনা বিকাশের পথ ধরে চিনেছে ইংরেজদের সাম্প্রদায়িক রূপটি। তারপর তো রচিত হয়েছে এক অন্য ইতিহাস। বাঙালির জীবনে এসেছে বার-কালচার। ফাইভস্টার হোটেলের নারী-বিলাসিতা। থিয়েটারের সেই পর্যায়ে আটকে নেই বিনোদনের উপকরণ, সিনেমাহলে ছেয়ে গেছে শহর কলকাতা। বাড়িতে বসেই বুকিং হচ্ছে মুভি টিকিট। এভাবেই সময়ের সাথে জীবনযাত্রার সাথে বদলাচ্ছে বাঙালি জীবনের চালচিত্র, আমোদ-প্রমোদের ধরন।

ফোটো: প্রলয় হাজরা

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (২৩৫৯১৯১৫, ২৩৩৭১১৫০)

সিইএসসি গ্রাহক পরিষেবা (২৪৭৮৪৩০২, ২৪৭৮৪৮৮৮, ২৪৭৮৪৮৮৯)

অভিযোগ:

সিইএসসি (উত্তর) ২২৩৭৩১৬১, ২২৩৭৬৪

সিইএসসি (দক্ষিণ) ২৪৬৬৪৬৪৩, ২৪৬৬৩১৬১, ২৪৬৬৩১৬২

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২২ মে ২০১৭

সুরে সুরে নজরুল

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব : ছয়

‘কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট, রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণবেদী’—সরগমটা ভালো করে লক্ষ করো, প ধ সা সা সা সা সা, সারে সানি সা গ গ গ গ, প প রে গ প প রে গ প প প প। আরেকটু প্রাণ দাও। ভালো হবে। রেওয়াজটা ঠিক মতো না করলে...। রেডিওতে গান শুনে শুনে গুন গুন করাটা আমার স্বভাব। ঠাকুমা তাই দেখে আমার জন্য মাকে বলে এক গানের টিচার জোগার করেছেন। তিনি আসেন নিয়মিত। কিন্তু আমার গান শেখা হয় না। তবু...। নজরুলের গান কবিতায় কেমন একটা জেগে ওঠার ডাক রয়েছে। ঠাকুমার কাছে শুনেছি এই নজরুল নাকি বেতারে এক সময় গান শেখাতেন। সংগীত পরিচালকের ভূমিকাতেও চাকরি করেছেন বেশ কিছুদিন। বেতারের অনেকেই সেইসব স্মৃতিকথা বলেছেন নানা জায়গায়। আজ সেইসব কথা দিয়ে সুরে সুরে নজরুল।

সালতামামির হিসাবে নজরুল বেতারের সঙ্গে তাঁর গাটছড়া বেঁধেছিলেন ১৯২৮-২৯ সালে। ১৯২৮ সালে তিনি বেতারে একটি গান গেয়েছিলেন। পরের বছর স্বকণ্ঠে ছিল আবৃত্তি। ইতিমধ্যে নজরুলের ‘ধূমকেতু’, ‘লাঙ্গল’ প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় কলকাতা বেতার এবং গ্রামোফোন কোম্পানি এইচএমভি-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে মঞ্চে এবং চলচ্চিত্রেও তিনি কাজ করতে শুরু করলেন। চুক্তিবদ্ধ হয়ে বেতারের সঙ্গে কাজ শুরুর আগে থেকেই তাঁর গান রেডিওতে শোনা গেছে। কখনও তিনি গেয়েছেন, কখনও আবার উমাপদ ভট্টাচার্য, ইন্দুবালা দেবী, আঙুরবালা দেবী এঁদের কণ্ঠে শোনা গেছে তাঁর গান। তখনও এই গান আলাদা করে নজরুলগীতি রূপে স্থান পায়নি, বাংলা আধুনিক গান হিসাবেই সম্প্রচারিত হতো। তবে রেডিওতে অন্যান্য গানের মতোই তাঁর গানও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১৯৩২ সালের ১৪ জানুয়ারি প্রকাশিত ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে, পঙ্কজকুমার মল্লিককৃত নজরুল রচিত একটি গানের স্বরলিপি ছাপা হয়েছে। গানটি ছিল ‘দোলে নিতি নবরূপের ঢেউ’। ধীরে ধীরে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে। বেতার-নাটকের জন্য তখন তিনি গান লিখছেন। ১৯৩২ সালে মন্মথ রায়ের ‘মহুয়া’, ১৯৩৬ সালের জগৎ ঘটকের ‘জীবনস্রোত’, ‘মীরা উৎসব’ ইত্যাদি নাটকে নজরুলের গান ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যে পাওয়া যাচ্ছে, ১৯৩০ সালে ৫ অগাস্ট কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মরণে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে ‘শরৎ শর্বরী’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। শোনা যায়, এই অনুষ্ঠানে নজরুল একটি কবিতা পাঠ করেন।

এরপরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে বিদ্রোহীকবি বেতারের স্থায়ী কর্মী হন। ১৯৩৮ সালে যে ‘দেবস্তুতি’ গীতিনাট্য সম্প্রচারিত হয়, তার গীতিকার এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং কবি। সংগীত পরিচালক ছিলেন নিতাই ঘটক। ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকায় এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ‘হিন্দুর মহাদেবী আদ্যাশক্তির বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপের যে মহনীয় বিকাশ— সেই শ্রীশ্রীমহাকালীর প্রকটকালের ভাব সংগীত এই দেবস্তুতি।’ গানগুলি গেয়েছিলেন ‘বাসন্তী বিদ্যাবীথি’ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। ভাষ্যপাঠে ছিলেন স্বয়ং নজরুল। সেই সময় অনুষ্ঠানটি

আকাশবাণীর স্টুডিওতে নজরুল

এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ২৫ জুলাই ১৯৩৯ সালে সেটি পুনরায় প্রচারিত করা হয়।

বেতারের বিভিন্ন স্মৃতিকথায় পাওয়া যাচ্ছে স্থায়ীপদে বেতারকেন্দ্রে যোগ দেওয়ার পর কাজী নজরুল নিজে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে শুরু করেন। বিশেষভাবে স্মরণীয় রাগসংগীত বিষয়ে তাঁর পরিচালিত ‘হারমণি’ অনুষ্ঠানটি। নলিনীকান্ত সরকারের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় ‘নবরাগমালিকা’ নামক একটি অনুষ্ঠান যেখানে নিঝরিণী, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা, দোলনচাঁপা প্রভৃতি রাগগুলি নজরুল তৈরি করেছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখছেন, ‘গানের সুরে তিনি ডুবে যেতেন সব সময়ে। দুপুর একটা থেকে শুরু করে রাত্রি আটটা পর্যন্ত অক্লান্তভাবে সংগীত শিক্ষাদান করছেন কয়েকজন গায়ক-গায়িকাকে নিয়ে। বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই। অবসাদ নেই। একটা চাদর পাতা তক্তপোষের ওপর বসে অবিরত পান খেতে খেতে গান শেখাতেন তিনি।’

অন্যদিকে ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় দুটি চিঠি, যেখান থেকে বোঝা যায় যে বেতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নজরুলের প্রোগ্রামভিত্তিক চুক্তি ছিল, বেতনভিত্তিক চাকরি তিনি করতেন না। এই কলকাতা বেতারেই তাঁর সংগীতের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। অপ্রচলিত বহুসংখ্যক রাগকে যেমন বাংলা গানের কাব্যিক মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন, তেমনই ১৮টি রাগ সৃষ্টি করে বাংলাগানের পরিধি বিস্তার করেছেন। বাংলায় ‘লক্ষণগীত’, তাঁর অন্যতম সংযোজন যা বেতারেই সম্প্রচারিত হয়েছিল। আমরা জানি, জীবনের শেষ ৩৬ বছর নজরুল বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই বেতারকেন্দ্রেই তাঁর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ‘ছোটদের আসর’ অনুষ্ঠানে কবির কিছু বলার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন বহু চেষ্টা করেও তিনি একটি স্বরও বের করতে পারেননি। এরপর ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তাঁর কলম থেকে কোনও সৃষ্টি হয়নি, মুখ থেকে কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়নি। কাউকে চিনতে পর্যন্ত পারেননি আর। শুধু কেউ যদি তাঁর সামনে তাঁর গান গাইতেন, তাহলে তাঁর মুখে একটু খুশির হাসি দেখা যেত।

কেন তাঁর মতো এমন এক শিল্পীর এই নির্মম পরিণতি, তা হয়তো আমরা কেউই জানি না। তবু তিনি মানেই আহ্বান, তিনি মানেই আগুন। বিষের বাঁশিতে তিনিই পারেন সুর লাগাতে। কালো মেয়ের পায়ের তলায় আলোর নাচনও তিনিই দেখাতে পারেন। আমির অহংকারে তিনিই বলতে পারেন, ‘...মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বল বীর, আমি চির উন্নত মম শির।’

ওরিয়েন্টাল স্কুল

পান্থজন

যাত্রাপাড়ার ইতিবৃত্ত শুনে আবার হাঁটার পালা। চিৎপুর আর বিডন স্ট্রিটের সংযোগস্থলের আগেই রয়েছে বিডন স্কোয়্যার যার বর্তমান নাম রবীন্দ্রকানন। পার্কের মধ্যে রয়েছে দু’টি মূর্তি। একটি রবীন্দ্রনাথের অন্যটি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের। এর পাশেই আছে পৌরসভা নির্মিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ। অন্যধারে রয়েছে রামকৃষ্ণ সংঘের মন্দির। পার্কের মধ্যে যখন দাঁড়িয়ে আছি, তখন মাথার উপর সূর্যদেবের উত্তাপ ক্রমশই বাড়ছে। সুতরাং খোলা মাঠের থেকে বেরিয়ে ছায়ার খোঁজ করতে ফুটপাত ধরে হাঁটা শুরু করলাম। আমার চলার পথে এবার পড়ল হরেকরকমের ছাপাখানা যেখানে চলছে সিল্কস্ক্রিন এবং ডিটিপির কাজ। লেটার প্রেসের দিন কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ছাপার ব্যাপারে ডিজিটাল মাধ্যমই ভরসা। এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম, থামলাম এক লালরঙা পুরনো বাড়ির সামনে। যে-বাড়িটি দেখে সহজেই হেরিটেজ তকমা দেওয়া যায়, সেখানে এক সময় ছিল গ্রামাফোন কোম্পানির দফতর এবং স্টুডিও।

এই বাড়ির স্টুডিওতে এক সময় কাজী নজরুল ইসলাম রেকর্ডিং করে গেছেন। বর্তমানে বাড়ির মালিকানা বদলেছে। একটু খোঁজখবর করতেই জানা গেল সামান্য এগোলেই বাঁয়ে পড়বে রবীন্দ্রস্মৃতি বিজরিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল। যে-স্কুল সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছিলেন, ‘কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্তি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে

নাই, কিন্তু একটি শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত।’ ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৬৮ সালে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও যেসব বিশিষ্ট মানুষ এই স্কুলে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, খেলাৎচন্দ্র ঘোষ, স্বামী অভেদানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অভিনেতা বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮২৯ সালে।

অতীতে স্কুলটি ছিল গঙ্গার ধারে মানিক বোস ঘাটের কাছে। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গৌরমোহন আঢ্য। তিনি ছিলেন কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মূলত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেদের পড়াশোনার জন্যই এই স্কুলের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অনেকেই সুবর্ণবণিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে হিন্দু কলেজের বহু ছাত্র খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। সমাজের সদস্যরা স্বধর্মকে বাঁচাতে উদ্যোগী হলেন। চেষ্টা করলেন যাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা খ্রিস্টান সমাজের দিকে না ঝোঁকে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠার পেছনে সেই ধরনের কিছু কারণও কাজ করেছিল। প্রতিষ্ঠার পর দু’বার জায়গা বদল করে স্কুল পাকাপাকিভাবে চিৎপুর রোডে চলে আসে। তখন ভাড়াবাড়িতেই স্কুলের কাজকর্ম চলত। পরে বাড়িসহ জমিটি কিনে নেন প্রাক্তন ছাত্রদের এক কমিটি। সেই কমিটির মাথার উপর ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সালটা ছিল ১৮৬৯। স্কুল প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্যর অকাল প্রয়াণের পরে তাঁর ভাই হরকৃষ্ণ আঢ্য স্কুলের দায়িত্ব নেন। এরপর থেকেই স্কুলের অবস্থা পড়তে শুরু করে। ছাত্রসংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পায়। তার আরও একটা কারণ ছিল বিদ্যাসাগরমশাই তখন মেট্রোপলিটন স্কুল খুলেছিলেন। সেখানেও অনেক ছাত্র চলে যাচ্ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির সম্পর্ক ভালো ছিল না, কারণ সতীদাহ প্রথা যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক দ্বারা রদ করা হয়, তখন হিন্দু সমাজে একটা গেল গেল রব ওঠে। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, যাঁরা হিন্দু সমাজের সংস্কার চাইছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে গঠিত হিন্দু মহাসভার বিরোধ বাধে। তৎকালীন হিন্দু মহাসভা রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর, মতিলাল শীল, গোপীমোহন দে প্রমুখের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ইতিহাস শুনতে শুনতে স্কুল বিল্ডিং ঘুরে দেখার সুযোগ হল। স্কুল কর্তৃপক্ষ ইতিহাস ধরে রাখার জন্য এক আর্কাইভ গড়ে তুলেছেন।

ঐতিহাসিক স্কুল প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে হাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ল চিৎপুর রোডের বিচিত্র ব্যবসার মধ্যে অন্যতম বাণিজ্যের কয়েকটি দোকান। যেখানে সাজানো রয়েছে নানান আকৃতির লোহার সিন্দুক যেগুলি বিক্রিতব্য। অতীত কলকাতার কিছু পুরনো বাড়িতে এক সময় এই ধরনের সিন্দুক দেখা যেত। যেখানে পরিবারের স্ত্রীধন সুরক্ষিতভাবে রাখা থাকত আর থাকত দলিল-দস্তাবেজ। এখন এগুলো শুধুমাত্র দেখা যায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জুয়েলারির দোকানে।

এগিয়ে চলি চিৎপুর এবং বি কে পাল এ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে। চলার পথে ডানদিকে পড়ল কলকাতা পুরসভার দ্বারা সংস্কারপ্রাপ্ত জয় মুখার্জি পার্ক। পরের সংখ্যার জন্য রইল পরবর্তী আকর্ষণ। সেও এক ধরনের বাণিজ্য যার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ।

ফোটো: লেখক

অনলাইন বুক সেলিং আদৌ কি তৈরি করতে পারছে নতুন পাঠক?

তন্ময় মণ্ডল

ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সাথে কথা বলা। ফরাসি দার্শনিক রনে দেকার্তের এই উক্তি জীবনের পরতে পরতে এক গভীর সত্য। সত্যিই কি বইয়ের চেয়ে ভালো বন্ধু কেউ হতে পারে? মন ও মননের বিকাশে বইয়ের বিকল্প কিছু নেই। স্টুডেন্ট লাইফে পড়ার বইয়ের ভেতরে গল্পের বই ঢুকিয়ে পড়েননি এমন বইপ্রেমী বোধহয় নেই।

কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা মানেই আনমনা পাঠকের কাছে নতুন-পুরনো বইয়ের গন্ধে বিভোর করা পরিবেশ। চারিদিকে বিপুল বই-সাম্রাজ্য। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে! পছন্দের লেখক, পছন্দের বই— এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া। হাতে নিয়ে নতুন বইয়ের পাতা ওলটানোর স্বাদটাই আলাদা। বইপাড়া মানেই বহু বছরের পুরনো ঐতিহ্য।

এখন অবশ্য পাঠক চাইলে বাড়িতে বসেই অনলাইন ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছেন পছন্দের বই। ই-কমার্স বা অনলাইন ওয়েবসাইটগুলোর দৌলতে পাঠক ঘরে বসে ভারচুয়ালি নেড়ে-চেড়ে দেখতে পারছেন প্রচুর বই। কিনে পড়ছেনও। প্রবাসীরাও পছন্দের বই পেয়ে যাচ্ছেন অনেক সহজেই। সোজা কথা হল এই যে, বিশ্বায়নের যুগে মানুষের ব্যস্ততা প্রচুর, তার মধ্যে বইয়ের সাথে সময় কাটাবার সময়টুকুতেও ভাগ বসাচ্ছে বিনোদনের অন্যান্য উপকরণ। আর একটা ব্যাপার হল আমারা দাঁড়িয়ে আছি ২০১৭ সালে, যেখানে মানুষের হাতে অ্যানড্রয়েডের ছড়াছড়ি। আঙুলের ছোঁয়ায় চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে স্বপ্নের জগৎ। সেখানে প্রিয় বইয়ের খোঁজ যদি কেউ বাড়ি বসেই পায় তাহলে আর বাইরে বেরোবার দরকার কী? সময়ের তো একটা দাম আছে বই কি।

সময়ের সাথে সাথে বদলেছে বই-এর প্রেজেন্টেশনের ধরন। এসেছে ই-বুক। অডিও বুক। আপডেটেড জেনারেশনের সাথে সমানে পাল্লা দিচ্ছে সময়। বদলে যাচ্ছে মানুষের রুচিবোধ। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলা বই-বাজারের বিক্রি কমছে। কমে যাচ্ছে বইয়ের ওম নেওয়া পাঠকের সংখ্যা। তার কারণ কি মানুষের জীবনের চরম ব্যস্ততা? নাকি অন্যান্য বিনোদনের উপকরণের কাছে হার মানছে বই? ই-কমার্সগুলো কি পারছে ব্যস্ততা কাটিয়ে নতুন পাঠক তৈরি করতে? এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই আজ আমি কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়।

অনিমেষ প্রামানিক (প্রকাশক): কলেজ স্ট্রিট তো আছেই, তবে বইপ্রেমী মানুষ বা পাঠক কমছে এ কথা কিছুটা অংশে সত্যি হলেও পুরোপুরি নয়। আমার মনে হয় এই চরম ব্যস্ততার লাইফস্টাইলে টাইম একটা বড় ফ্যাক্টর। আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি যদি বাড়িতে বসে বই পছন্দ করার সুযোগ পান, অন্য অপশন ভাববেন কেন? আমাদের বিভা পাবলিকেশনের ওয়েবসাইটে আপনি দেখবেন প্রত্যেকটি বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা ফ্রি রিডিং-এর জন্য পিডিএফ আকারে দেওয়া আছে। ফলে পাঠকদের জাজমেন্ট করতে বা চয়েস করতে সুবিধে হয়। আর আপনাকে যদি আমাদের পরিসংখ্যান বলি, আমাদের ওয়েবসাইট থেকে বহু মানুষ বই অর্ডার করেন, তাঁদের বেশিরভাগই ইয়ং জেনারেশন। আবার তাঁদের অনেকেই কর্পোরেট অফিসগুলোতে কর্মরত। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, এই অনলাইন পরিষেবার জন্য আউট অব ওয়েস্টবেঙ্গলে যে সমস্ত বাঙালিরা থাকেন, তাঁরাও পছন্দের বই অনলাইনে অর্ডার করতে পারছেন। আর আমরা সবসময় চেষ্টা করছি তাঁদের মতো করে বই পরিবেশন করতে। তাই দেখবেন আমাদের পাবলিকেশনের বইগুলো পেপারব্যাক আর ট্রেন্ডি। এতে আমার মনে হয় অনেক বইপ্রেমীরা যাঁরা সময়ের অভাবে পছন্দের বই কিনতে আসতে পারছিলেন না, বই তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আর এই অ্যানড্রয়েড, অ্যাপের যুগে দাঁড়িয়ে ক্যান্ডি ক্রাশের বদলে মেট্রোতে বসে কাউকে বই পড়তে দেখা! সেটাই তো প্রাপ্তি।

সুমন্তর বল্লভ (পাঠক): কলেজ স্ট্রিটে এসে একটা দোকানে বই ঘেঁটে দেখাটা খুব ডিফিকাল্ট। সপ্তাহে ছ'দিন অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর আর ইচ্ছে করে না। আর রবিবারে তো আবার কলেজ স্ট্রিট বন্ধ। ছোটবেলার বই পড়ার সেই নেশাটা আছে ঠিকই তবে সবসময় তো কলেজ স্ট্রিটে আসা হয় না। তার চেয়ে আমি অনলাইনে প্রচুর বই দেখতে পাচ্ছি। সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক প্রকাশকের বিজ্ঞাপন দেখেও অনলাইনে পছন্দমতো বই অর্ডার করতে পারছি। বাড়িতে এসে বইও দিয়ে যাচ্ছে। তাই আমার মনে হয় অনলাইন সেলিং অনেক পাঠকদের, যারা বিজি শিডিউলে আটকা পড়েছে, অ্যাটলিস্ট তাদের হাতে বইটা পৌঁছে দিতে সমর্থ হচ্ছে। এতে পুরনো বইপড়ার অভ্যাসটা তো ফিরে আসছে।

সৃজিত চৌধুরী (পাঠক): আমি বেঙ্গালুরুতে থাকি, কর্মসূত্রে। সেখানে বাংলা বই প্রায় দুষ্প্রাপ্যই বলা চলে, আর নতুন লেখকদের বা নতুন প্রকাশনার বই তো আরও। তাই যখনই বাড়ি আসি কলেজ স্ট্রিটে একবার ঢুঁ মেরে যাই। তবে একটা কথা ঠিক অনলাইনে অনেক বাংলা বই পাই ওটা অনেকটা সুবিধাজনক। ডিসকাউন্ট ও ডেলিভারি চার্জ মিলিয়ে দাম প্রায় কলেজ স্ট্রিটের সমানই তো। তবু কলেজ স্ট্রিটে আসি সময় পেলে কারণ এই বুক-ওয়ার্ল্ডে হারিয়ে যাবার মজাই আলাদা। নিজে হাতে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপালটে দেখা যায়।

স্বরূপ দে (বই-বিক্রেতা): বই বিক্রি হচ্ছে। তবে পুরনো লেখকদের সাথে সাথে নতুন লেখকদের অনেকেই আছেন যাঁদের বইয়েরও মার্কেটে কাটতি আছে। অনলাইনে বিক্রির অনেক সুবিধা আছে। তবে আমার মনে হয় যাঁরা বই পড়বার তাঁরা পড়বেনই, তা সে যেমন করেই হোক। তবে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনাগুলোর পাশাপাশি নতুন প্রকাশকদের অভিনব পদ্ধতিতে বইয়ের উপস্থাপনা পাঠকদের টানছে। অনলাইন বই বিক্রির পরিষেবা যদি বইবিমুখ কিছু মানুষকে বই পড়াতে পারে, তবে সেটাই সাফল্য।

ফোটো: সুমিত দেব

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা (তিনের পাতার পর)

ফাইন। বলে লম্বা জামার পকেট থেকে বের করল একটা চৌকো বই। বইটা আমার হাতে দিয়ে বলল এই নাও জেন্দ-আবেস্তা। আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাকে দিলাম। আমাদের কোনও প্রিয়জনের দেহ যখন শকুনের খাদ্য হিসেবে টাওয়ার অব সাইলেন্সে রাখা হয় তখন শুধু এই ধর্মগ্রন্থ দেওয়া হয় মৃতদেহের সঙ্গে। তুমি এটা রাখো। তোমাকে উপহার দিলাম।

বিকেলের আলো মুছে এসেছিল প্রায়। বাতাস বইছিল দ্রুত গতিতে। আমি আর টাওয়ার অব সাইলেন্সের গম্বুজের ভেতর ঢুকলাম না। ইশতারকে বললাম, আমাকে বাড়ি যেতে হবে। মনে হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হবে। বারান্দা থেকে জামা-কাপড় তোলা হয়নি। দেরি হলে সব ভিজে যাবে।

ইশতার হেসে ঘাড় নাড়ল। মনে রেখো আমাকে। রিমেমবার মি।

আমি হাত নেড়ে রাস্তায় বেরোতেই জোরে বৃষ্টি। ভিজে একসা

হয়ে বাড়ি ফিরলাম। বারান্দার কাপড় জামাও ভিজে গিয়েছে পুরোপুরি। ইশতারের দেওয়া জেন্দ-আবেস্তা-কে সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশে রেখে দিলাম যত্ন করে। মাথা মুছতে মুছতে জানলার ধারে গেলাম। চেয়ারের নীচে যেখানে শকুনের মুখ থেকে ছিটকে একটা খুবলোনো আঙুল পড়েছিল; নিচু হয়ে সেই জায়গাটা দেখলাম। আঙুলটা আর দেখা যাচ্ছে না। পিঁপড়ের ঝাঁক আঙুলটাকে ঢেকে দিয়েছে। আমি পিঁপড়েদের তাড়ালাম না। ইশতার আমাকে বলেছিল, 'শরীরের প্রতিটি কোষ; রক্ত মাংস যতক্ষণ না কেউ খেয়ে ফেলছে ততক্ষণ আমাদের মুক্তি ঘটে না।' জানলা খুলে দিতে ঘরে খেলে গেল ঠান্ডা হাওয়া। জানলার সামনে একটা রাস্তা। রাস্তা পেরোলে বিশাল মহীরুহদের আড়াল। সেই বট, অশ্বত্থ, নিম, পাকুড় গাছের আড়ালে নিঃস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে কলকাতার পারসিকদের বিরল ইতিহাস। টাওয়ার অব সাইলেন্সের গম্বুজ।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২২ মে ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ - ২২৪১৯০১, ২২৪১৪৯০৪

বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার - ২৪৫৬৭০০১, ২৪৫৬৭০০৫

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২৫৫৫৭৬৭৬, ২৫৫৫৭৬৫৬

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২২৪৪৩২১২, ২২৪৪৩২১৭

পিয়ারলেস হসপিটাল - ২৪৬২২৩৯৪, ২৪৬২২৪৬২

উডল্যান্ডস - ২৪৫৬৭০৭৯, ২৪৫৬৭০৭৬

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান - ২৪৭৫৩৬৩৬, ২৪৭৫৩৬৩৮

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২২ মে ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, অলি থেকে গলি সে এক অদ্ভুত নেশার মতো লাগছিল

কে. এস. শফিক (তবলাবাদক/যন্ত্রশিল্পী)

আমরা যারা বাংলাদেশে জন্মেছি তাদের কাছে কলকাতা মানে এক অভিন্ন আত্মার শহর। ছোটবেলা থেকেই কলকাতার গল্প শুনে বড় হয়েছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কলকাতার আদব-কায়দাকেও অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি যতটা জেনেছি। অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল কলকাতা শহরটাকে সামনে থেকে দেখার। কলকাতার স্পর্শ পাওয়ার সাধ পূরণ হল বছর দুয়েক আগে। আমার মতোই আর এক তবলাবাদক যার দিন থেকে রাত কাটে তবলার সাহচর্যে তিনি কলকাতার মানুষ, নাম আকাশ নায়েক। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব সবটাই হয়েছিল ফেসবুকে। তবে তিনি যখন একটা শো-এ ঢাকা এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটেই উঠেছিলেন।

বন্ধু আকাশের ডাকে সাড়া দিয়েই আমার প্রথম কলকাতা আসা সংগীতকলা পরিষদের একটা ওয়ার্কশপে। প্রথম যখন এয়ারপোর্টে নামলাম একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি চলে গেলাম সল্টলেকে ওর ফ্ল্যাটে। পরের দু'দিনব্যাপী ছিল তবলার ওয়ার্কশপ। দু'দিনব্যাপী আয়োজিত ওই ওয়ার্কশপে প্রচুর ছেলে সারা বাংলা থেকে অংশ নিয়েছিল। প্রশিক্ষক হিসাবে সেখানে যোগ দেওয়া ছিল আমার কাছে গর্বের।

ওয়ার্কশপ শেষ হবার পরদিন থেকে শুরু হল আমার কলকাতাকে ঘুরে দেখা। আকাশ আর তার ঘুরে বেড়ানোর নেশা আমায় জীবনের সেরা দুটো দিন উপহার দিয়েছে। শুরু হল শহরের বুক চিরে আকাশের গাড়ি ছুটে চলা। প্রথমদিন আমরা গেলাম অনেক ঐতিহ্যের সাক্ষী কফি হাউসে আড্ডা দিতে,বইপাড়া ঘুরতে। দেখলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ সেখানে থেকে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি। তারপর গাড়ি ছুটে চলল রবীন্দ্রসদনের দিকে সেখানে গিয়ে দেখলাম বিড়লা তারামণ্ডল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আর সেদিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে দেখা একটা নাটক। একই ভাষায় আমরা কথা বলি তবু তাদের উপস্থাপনা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক আলাদা। কী অদ্ভুত সে পারফরমেন্স। মোহিত হয়ে উপভোগ করেছি নাটকের সাথে সাথে তাদের ড্যান্স ট্রুপের পারফরমেন্স।

সেদিনের মতো বাড়ি ফিরলাম। পরেরদিন সোজা দক্ষিণ কলকাতায় ওর এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সায়েন্স সিটি গেলাম সবাই মিলে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাথে সৌন্দর্যের মেলবন্ধন সে এক অপরূপ স্থান। তারপর আমি বললাম গঙ্গা দেখাবার কথা। ছুটে চলল আকাশের গাড়ি। যেতে যেতে ও দেখাল আকাশবাণী ভবন। তারপর পৌঁছলাম বাবুঘাট। গঙ্গার পাড়ে বসে আছি। তখন বিকেল, অপরূপ মায়ার ছটা গঙ্গার বুকে, এ যেন মায়াবী শহরটাকে অন্য এক আঙ্গিক দিচ্ছে। বাড়ি ফেরার পথে আমরা গেলাম ধর্মতলা সেখানে কিছু কেনাকাটা করলাম।

কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, অলি থেকে গলি— সে এক অদ্ভুত নেশার মতো লাগছিল। দুটোদিন শুধু কলকাতা শহরটাকে দেখেছি। আর দেখেছি উত্তর থেকে দক্ষিণে কত আলাদা বাড়ি-ঘরগুলো। খানিকটা তফাতও আছে বলে মনে হল জীবনযাত্রায়। তবে শহরের প্রতিটা রাস্তায় অদ্ভুত এক ভালোবাসার স্পর্শ। আমি অন্যদেশ থেকে গেলেও মনে হয়েছে যেন এ আমার নিজের শহর।

এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেসব স্মৃতি। আসলে সুখের স্মৃতি সর্বদাই মন ভালো করে। আর প্রিয় শহর কলকাতাও তাই।

ফোটো: প্রলয় হাজরা

সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী

সোমনাথ আদক

প্রথম জীবনে তাঁর সরগম চিনতে শেখা বাবার হাত ধরে, কিন্তু চাকরি জীবনের শুরুটা কলকাতার বেতারে তবলাবাদক হিসাবে। তারপর বিভিন্ন সময়ে ওস্তাদ এনায়েত খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ প্রমুখ সংগীত সম্রাটের সঙ্গে সংগত করেন তবলায়। কিন্তু তখনও তাঁর সংগীতচর্চা থামে না। তবলার পাশাপাশি চলতে থাকে কণ্ঠ সাধনা। সময় হাঁটতে থাকে তাঁর নিজের পথ ধরে। একদিকে কঠিন সাধনা অন্যদিকে কঠোর অধ্যবসায়, একসময় আবার তাঁকে পরিণত করে বাদক থেকে গায়কে। প্রতিষ্ঠা লাভ করেন কণ্ঠশিল্পী হিসাবে। হয়ে ওঠেন কোটালি ঘরানার প্রাণপুরুষ। কিন্তু কে এই সংগীতশিল্পী? আর কীভাবেই-বা হয়ে উঠলেন হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোটালি ঘরানার বেতাজ বাদশা? জানব... জানব কেমন ছিল তাঁর সংগীতময় জীবনের চলার ছন্দ, তাল-মাত্রা-লয়...

সালটা ১৯০৮-এর ১ এপ্রিল, বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়, এক সংগীতশিল্পী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন তারাপদ চক্রবর্তী। বাবা পণ্ডিত কুলচন্দ্র চক্রবর্তী ও মা দুর্গারানীদেবী। তাঁর কাকা ন্যায়রত্ন রামচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন নাটোরের মহারাজার দরবারের 'দ্বার পণ্ডিত' ও সভা গায়ক। পণ্ডিত কুলচন্দ্র চক্রবর্তী, তাঁর বাবা ও ঠাকুরদা তিন পুরুষ ছিলেন সংগীতজ্ঞ। তারাপদ চক্রবর্তীর সংগীতে হাতেখড়ি হয় তাঁর বাবা পণ্ডিত কুলচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছেই। পরবর্তীকালে গোয়ালিয়র ঘরানার পণ্ডিত সাতকড়ি মালাকার ও তারও পরে আগ্রা, দিল্লি, বেনারস ও আরও অনেক ঘরানায় শিক্ষিত পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেন তিনি।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার শৈশব কাটিয়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। ১৯২৯ সালে ২০ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করলেন কলকাতার অ্যালবার্ট হলে। কেরিয়ারের শুরুতেই নজরে পড়লেন সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়ালের। এবং তিরিশের দশকের শুরুতে তাঁরই পরামর্শ ও সহায়তায় কণ্ঠশিল্পের পরিবর্তে তবলা শিল্পী হিসাবে যোগদান করলেন অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতার বেতারে।

চাকরিসূত্রে তবলা শিল্পী হিসাবে, বিভিন্ন সময়ে যেমন সংগীতের বহু দিকপাল সম্রাটের সঙ্গে বাজিয়ে চলেছেন, তেমনি সংগীতশিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য পাশাপাশি চলছে তাঁর কণ্ঠ সাধনাও। শুধু যেন একটা সুযোগের অপেক্ষা! এসে গেল তাঁর বহু প্রতীক্ষিত সেই সুযোগটি। একটি সংগীতানুষ্ঠানে সংগীতজ্ঞ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী অসুস্থতার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। তখন জ্ঞান গোঁসাইয়ের মতো সংগীতজ্ঞের জায়গায় তারাপদকে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ করে দিলেন সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়াল। তারপর তো ইতিহাস। সময় যত গড়িয়েছে তার চেয়েও দ্রুত ছড়িয়েছে তাঁর সুনাম এবং সারা ভারত জুড়ে তিনি সংগীত পরিবেশণ করেছেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান, ওস্তাদ আবদুল করিম খান, ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে। ওস্তাদ আবদুল করিম খান, ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর তাঁর গুণমুগ্ধ হন এবং তাঁকে অবিভক্ত বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান প্রাণপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তিনি একই সাথে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 'বিলম্বিত একতাল'-এর উদ্ভাবন করেন তিনি। বিভিন্ন ঘরানার প্রভাব ও নিজের সংগীত সাধনার ফলশ্রুতিতে একটি স্বতন্ত্র গায়কি রপ্ত করেন সংগীতজ্ঞ তারাপদ চক্রবর্তী। এখন যাকে 'কোটালি গায়কী' বলা হয়। তিনি লোকগীতি, ভজন, কীর্তন ইত্যাদিও গেয়েছেন এবং একই সাথে তিনি একজন কবিও ছিলেন। এছাড়াও তিনি অনেক খেয়াল ও ঠুমরির বন্দিশ কম্পোজ করেছিলেন। সুরতীর্থ নামে তাঁর একটি গ্রন্থও আছে।

সংগীতজ্ঞ তারাপদ চক্রবর্তী একজন সংগীত শিক্ষকেরও দায়িত্ব পালন করেন। সংগীতগুণী রূপে বিভিন্ন সংগঠন তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে। পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়ার পণ্ডিত সংগীত সমাজ তাঁকে 'সংগীতাচার্য', কুমিল্লার সংগীত পরিষদ তাঁকে 'সংগীতার্ণব' এবং বিদ্যুৎ সম্মিলনী তাঁকে 'সংগীত রত্নাকর' উপাধি দেয়। সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭২ সালে তিনি দিল্লির সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন, এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বিশ্বভারতীর নির্বাচন বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সময় কখনও থেমে থাকে না। থেমে থাকে না সৃষ্টি ও সৃষ্টিশীল মানুষের পথ চলা। কখনও সে পথ হয় ফুল ছড়ানো, কখনও কাঁটা বিছানো। যেমন মানুষের পথ, তেমনি কখনও নিখাদ, তো কখনও তার সপ্তক ছুঁয়ে চলে সুরেরও পথ চলা। কিন্তু সুরের পথ চলা থামে না। থেমে যায় শিল্পীর পথ চলা। শিল্পী চলে যায়, সৃষ্টি হারায় না। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অমরত্ব লাভ করে শিল্পী। আর তাইতো অজস্র মানুষের মনের মণিকোঠায় আজও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে অক্ষয়— অমর হয়ে আছেন, সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী।